Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-IV, April 2019, Page No.106- 117
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলা ভাগবতের অনুবাদ ও ভাগবত অনুসারী সাহিত্যে প্রতিফলিত নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান

কিশোর শর্মা
গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract

Bengali metaphrases and conforming literature have begun just after the invasion of turkey in bengal. If we retrace the stream of metaphrases literature we can see that, just like Ramayana and Mahabharata, Bhagabata has also its own literary and socio-historical significance. In Bhagabata's translated literature work, the middle age's social aspects is reflected, where we can explore some realistic data of woman's household and domestic life. Depending on that fact a reader can easily identify woman's social position on that specific time. In Bhagabata's translation and conforming literature woman's helpless picture in a patriarchy society is showed. Woman's who belongs to rural society; their day to day domestic waveless life scenario is also reflected there. Polygamy issue, co-wife problem, torture upon bride by her husband and in-laws, social position of economically self-reliant subaltern woman, all these issues related realistic fact is also being found in translation work of Bhagabata. In Bhagabata's metaphrases literature characters like Radha, Gopini, Rukmini, Satyavama, fruit seller, scent seller and beautician, cook etc uphold women's position in patriarchy society of middle age. In many context of Bhagabata we can see that women's are treated as man's property. Maladhar Bose, Daibakinandan Singh, Vabananda, Krishna Das, Abhiram Das, Pitambar, Kavi Ballaba – in all their metaphrases work there are many examples of abducting and assaulting woman. Abduction of Shuvadra, abduction of sixteen thousand women by Narakasur, after Krishna's death his wives assaultation by demon, are all examples of my previous line standpoint. Social and domestic position of woman, reflected in Bhagabata's translation work in Bengali (depending on published and selective books) within 15th-18th century time frame has been elaborated in our main discussable article, which historical and social significance is unmeasured.

Keyword: Metaphrase; Bhagabata; gender; patriarchy; subaltern.

এক

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষান্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মহতি।। [১]

অর্থাৎ স্ত্রীলোক কুমারী অবস্থায় পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের অধিকারে থাকেন। সুতরাং স্ত্রীলোক স্বাধীনতার যোগ্য নয়। এই স্বাধীনতাহীন জীবনে নারীর পরিচয় শুধু পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কীত। কন্যা-জায়া-জননী বৃত্তে নারী শুধুমাত্র পরনির্ভরশীল, ভোগের সামগ্রী।

নারী পুরুষের সম্মিলিত অবদান হল সভ্যতা। একটি সুসভ্য জাতির সমাজে নারী পুরুষের সমধিকার স্বীকৃত থাকে। ভারতীয় সভ্যতার আদিলগ্নে নারীকে দেবী রূপে সম্মান দেওয়া হত। কিন্তু পরবর্তী কালে ভারতীয় সভ্যতায়ও নারী ধীরে ধীরে নরকের দ্বার রূপে কথিত হয়। কিছু স্বার্থান্বেষীর দল নারীকে অবদমিত করে রাখতে চাইলেও নারী সময় সময় নিজের শক্তি বলে নিজেকে প্রকাশ করেছে।

প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সাহিত্যে নারীর জীবন ও যন্ত্রনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সাহিত্য রচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আদিলগ্ন থেকেই নরনারীর মান-অভিমান, প্রেম ভালবাসা, দাম্পত্য জীবন বাংলা সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে। যদিও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ধর্মকেন্দ্রিক তবু তা বিভিন্ন ভাবে মানব জীবনরস সম্পৃক্ত। চর্যাপদে যেমন দেখা যায় দুঃখিনী নারীর দুর্দশার চিত্র, তেমনি *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও মঙ্গলকাব্যেও দেখা যায় পুরুষতন্ত্রের অত্যাচারে অত্যাচারিত দুঃখিনী নারীর করুণ চিত্র; যা থেকে তৎকালীন সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে।

বাংলা অনুবাদ ও অনুসারী সাহিত্যেও আমরা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর সামাজিক অবস্থানটি দেখতে পাই। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের অনুবাদে সীতা, কৈকেয়ী, মন্দোদরী, দ্রৌপদী, কুন্তী, গান্ধারী, রাধা, যশোদা, রুক্মিণী, সত্যভামা, গোপনারী, ফলবিক্রয়িনী প্রমুখ নারীচরিত্র নারীর সামাজিক অবস্থানটিকে প্রকাশ করেছে। সংসার জীবনে নারীর মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে নারীত্বকে অবহেলা করা, সতীন যন্ত্রনা দ্বারা দুঃখ ভোগ করা, পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতন দ্বারা মানবতাকে পদদলিত করা, শাশুড়ি ও ননদিনি কর্তৃক বধূ নির্যাতন, বিভিন্ন পেশা গ্রহণের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার মত বিভিন্ন অন্ধকারময় দিকের বাস্তব তথ্য ভাগবতের অনুবাদে পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা, সনকা, মেনকা, নেতা প্রভৃতি চরিত্রগুলি যেমন তৎকালীন সমাজের শ্রেণি চরিত্রটিকে প্রকাশ করেছে, তেমনি ভাগবতের অনুবাদে গোপিনি, রাধা, দৈবকী, যশোদা, সুভদ্রা, উষা, রুক্মিনী, সত্যভামা প্রমুখ চরিত্রগুলিও মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থানটিকে তুলে ধরেছে।

দুই
লিঙ্গ ভিত্তিক সমাজ ও পরিবারে নারীর স্থান

জীবন প্রবাহে নারী কখনো কন্যা, কখনো পত্নী, কখনো মাতা রূপে সংসারে নিজের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ভাগবতের অনুবাদে নারী মাতা ও পত্নী রূপেই আমাদের সামনে বেশি উপস্থিত হয়েছে। পত্নী এবং মাতা রূপে সমাজ নারী যে সামাজিক মর্যাদা লাভ করত তার ঐতিহাসিক চিত্রটি ভাগবতের অনুবাদ ও ভাগবত অনুসারী সাহিত্যে পাওয়া যায়। জন্ম মাত্রই লিঙ্গ ভিত্তিক সমাজ শিশুর উপর নারী বা পুরুষ কেন্দ্রীক লিঙ্গের ধারণা আরোপ করে। পরিবারের সদস্য ও তার প্রতিবেশীরা মেয়ে শিশুটিকে বাল্যকাল থেকেই তার কী কী আচরণীয় তার প্রশিক্ষণ দিতে থাকে। ফলে তার মনে লিঙ্গ নির্দিষ্ট আচরণ ও কর্তব্য সম্পর্কে এক বদ্ধমূল ধারণার জন্ম হয়। বর্তমান কালে যদিও এই ধারণার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা যে তিমিরে ছিল এখনও সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

ভাগবতের অনুবাদে নারীদের বাল্যকাল থেকে শুনিয়ে আসা সেই সব নারী সুলভ আচরণ ও কর্তব্যের কথা জানা যায়। এই সব নারী সুলভ আচরণ ও কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে তাদের জীবনে যে দুঃখ দুর্দশা নামে আসত

তারও চিত্র রয়েছে। সে যুগে নারীদের প্রশিক্ষণের প্রথম ধাপই ছিল স্বামীর সেবা করা। স্বামী লম্পট-নেশাগ্রস্ত-অশক্ত যেই হোক না কেন তার জন্য জীবনপাত করাই ছিল নারীর প্রথম ধর্ম। সে যুগে স্বামীর বিরুদ্ধে কথা বলা ছিল মহাপাপ। যে নারী স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করে তার নরকেও স্থান হয় না- এই সব ভয় ভীতি দেখিয়ে নারীদের অবদমিত করে রাখা ছিল মধ্যযুগের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এক অপকৌশল। *গোপালবিজয়* কাব্যে এক গোপিনির মুখে শোনা যায় নারীর সতীত্ব ধর্মের ব্যাখ্যা। তাদের সমাজে নারীর কুলধর্ম ছিল স্বামী সেবা, স্বামী ছাড়া স্ত্রীর অন্য গতি নেই বলে তারা মনে করত-

জেবা কিছু কহিলে নারীর কুলধর্ম
প্রাণপতি-সেবা বিনে নাহি কোনো কর্ম।[২]

ভবানন্দের *হরিবংশ* কাব্যে পরিবার ও সংসার জীবনে নারীদের যে অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করতে হত তার বাস্তব ও করুণ তথ্য পাওয়া যায়। রাধা তার বিড়ম্বিত জীবনের অসহায়তার কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন যে সে যুগে নারীরা কুল-বধূ রূপে অন্তঃপুরেই জীবন কাটাত। কারণ ঘরের বাইরে গেলে স্বামী-শাশুড়ি-ননদিনি সন্দেহের চোখে দেখত। এমন কি ঘরের বাইরে লম্পট পুরুষের ভয়ও ছিল। অন্তঃপুরে থাকাকালীন অবস্থায় যদি তার ঘোমটা কোনো কারণে মস্তক চ্যুত হত তাহলে তার গঞ্জনার সীমা থাকত না। তাদের সারা জীবনই পরের অধীনে থাকতে হত বলে তাদের আক্ষেপের সীমা ছিল না। তাই রাধার মতে বিধাতা প্রদত্ত তাদের এই জীবন অতি নিকৃষ্ট, কারণ এই জীবনে স্বাধীন ভাবে বাঁচার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা নারী বলে ইচ্ছা মত খেতে-পরতে বা আনন্দ করতে পারত না। যদি কোনো নারী ক্ষুধার সময় পেট ভরে ভাত খেয়ে নিত তবে শাশুড়ি-ননদিনির অপমান জনক কথা সহ্য করতে হত। এই ঘটনা লিঙ্গগত বৈষম্যের চরম উদাহরণ। অসহায় নারীদের আনন্দ উপভোগ করার কোনো উপায় ছিল না। নৃত্য-গীত দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেই তাদের চরিত্রের প্রতি আঙ্গুল তুলত তার স্বামী বা শাশুড়ি। লিঙ্গগত বৈষম্যের এখানেই শেষ নয়, পুরুষ বহুগামী হলে দোষ ছিল না কিন্তু নারী যদি কোনো পুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকাত তখনই সমাজ তাকে কলঙ্কিনী অপবাদ দিয়ে সমাজচ্যুত করত।

আমি সব কুল-বধু থাকি অন্তঃপুর।
শিরের বসন কভু না করিছি দূর।।
পাপ ক্ষেণে বিধাতা সৃজিলা নারী-গণ।
পরের অধীন জান জীবন যৌবন।।
ক্ষুধা হৈলে সন্তোষে ভোজন করি যদি।
নানা ছলে গালি পাড়ে শাশুড়ী ননদী।।
নৃত্য-গীত দেখিবার যদি লয় মনে।
কলঙ্কী করিয়া তবে বোলে গুরু-জনে।।
**** *** ****
পুরুষ সকলে যদি পরদার করে।
তথাপিও তাহারে বাখানে সর্ব্ব-নরে।।
নারীয়ে পুরুষ যদি নিরক্ষয়ে রঙ্গে।
জন্মাবধি লজ্জা পায় সেহি ত কলঙ্কে।।[৩]

রাধার এই উক্তি থেকেই আমরা বুঝে নিতে পারি যে মধ্যযুগে সাংসারিক জীবনে নারীদের মর্যাদা কেমন ছিল। সে যুগে নারীদের না ছিল শিক্ষার অধিকার, না ছিল সামাজিক পদমর্যাদার অধিকার। নারীরা কেবলই পুরুষের ভোগের সম্পত্তি ও দাসী রূপে সংসারে পরিগণিত হত। তারা চরম ভাবে লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার ছিল।

তিন
সতীন সমস্যা ও নারীর দাম্পত্য জীবন

কৌলিন্য প্রথার ফলে সমাজে বহু বিবাহের মত সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তাছাড়া বংশ রক্ষার নামেও মধ্যযুগে চলত বহু বিবাহ। এক একজন কুলীন স্বামীর অনেক স্ত্রী থাকত। এক ঘরে যখন দুই বা ততোধিক স্ত্রী একসঙ্গে বাস করত তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মধ্যে ছোট ছোট বিষয়কে নিয়েও মনোমালিন্য হত। এক সতীন দ্বারা অন্য জনের প্রতি কটু বাক্য নিক্ষেপ, ছোটো ছোটো বস্তু নিয়ে ঝগড়া, স্বামীর প্রতি একাধিপত্য স্থাপন করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হওয়া, এক সতীন দ্বারা অন্য সতীন পুত্রের উপর অত্যাচার ইত্যাদি ছিল তখনকার নিত্য ঝামেলা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই সতীন সমস্যার নানা বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের হরিহোড়-এর বিবাহিত স্ত্রীদের বিবাদ, *রামায়ণ* -এ কৈকেয়ী দ্বারা রামকে বনবাসে পাঠানোর ঘটনা, *মনসামঙ্গল* কাব্যে বিমাতা চণ্ডী দ্বারা মনসার নিগ্রহ- ইত্যাদি মধ্যযুগীয় সমাজের সতীন সমস্যার জ্বলন্ত উদাহরণ। ভাগবতের অনুবাদ ও ভাগবত অনুসারী সাহিত্যেও সতীন সমস্যার বাস্তব ছবি খোঁজে পাওয়া যায়। মাধ্বাচার্যের *ভাগবতসার*, পরশুরাম চক্রবর্তীর *কৃষ্ণমঙ্গল*, ভবানন্দের *হরিবংশ*, দৈবকীনন্দন সিংহের *গোপালবিজয়* প্রভৃতি কাব্যে সতীন সমস্যার বাস্তব তথ্য পাওয়া যায়।

ভাগবতের অনুবাদে দেখা যায় কৃষ্ণ বহু বিবাহ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা ষোল হাজারের উপর। তাদের মধ্যে প্রধানা মহিষী ছিলেন আটজন। আবার তাদের মধ্যে প্রতিস্পর্ধী ছিলেন রুক্মিণী ও সত্যভামা। তারা দুই জনই রূপে-গুণে অতুলনীয়া। তারা উভয়েই স্বামী কৃষ্ণের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকতেন। কৃষ্ণ কোনো একজন স্ত্রীর প্রতি বেশি প্রসন্ন হলে অন্য স্ত্রী মুখ ভার করে থাকতেন। একবার দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে কৃষ্ণ একবার স্বর্গের উদ্যানের পারিজাত নামক স্বর্গীয় ফুল লাভ করেন। কৃষ্ণ সেই পারিজাত নামক সুন্দর ফুলটি প্রিয় পত্নী রুক্মিণীকে প্রদান করেন। এই খবর শুনে সত্যভামা কৃষ্ণ এবং রুক্মিণীর প্রতি ক্রুদ্ধ হন। তিনি মনে করলেন তার স্বামী রুক্মিণীকে তার চেয়ে বেশি ভালবাসেন। ঈর্ষায় তিনি রাজবেশ ত্যাগ করে ভূমিতে লুটিয়ে কাঁদতে লাগলেন। এমনকি তিনি রুক্মিণীর মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করে বলেন-

মরগো রূক্কীর্নি তোর হউক বজ্রাঘাত।
ঔশধে ভূলাইলা তুমি মোর প্রাণ নাথ।। [৪]

সত্যভামার সন্দেহ হল যে রুক্মিণী ঔষধ করে তার স্বামীকে বশীভূত করে নিয়েছে। তাই তিনি রুক্মিণীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে স্বামী কৃষ্ণের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হন। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে সোহাগ করে শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাকে ধাক্কা দিয়ে দূর করে দেন এবং নানা কটু কথা বলে দাম্পত্য অশান্তিকে আরও বাড়িয়ে তুলেন-

কতক্ষনে সর্ত্তভামা চেতন পাইয়া।
ক্রোধ করি ফেলিলেন কৃষ্ণকে ঠেলিয়া।।
ছাড় লম্পট গুরু ছাড় মোর ঘর।
রূক্কীর্নি করোগো কোলে আমি হৈলাম পর।।
আসিছ আমার ঘরে প্রভূ তুমি জানো কি।
সুনিলে গঞ্জিবে তোমা ভিস্মকের ঝি।। [৫]

নারীরা সতীনের ভয়ে সর্বদাই স্বন্ত্রস্ত থাকত। সতীনের ভয়ে নারীকে সর্বদাই নিজের আচার-আচরণকে সংযত রাখতে হত। বিনা কারণে একজন আর একজনের বিরুদ্ধে স্বামীর কাছে অভিযোগ জানাত। তারা সতীনের ভয়ে একা ঘরের বাইরে পর্যন্ত যেত না, গেলেই তাকে স্বামীর কাছে অসতী প্রমাণ করার জন্য অন্যজন ব্যস্ত হয়ে উঠত। তাই দেখা যায় দৈবকীনন্দন সিংহের *গোপালবিজয়* কাব্যে এক গোপিনি আক্ষেপ করে বলছেন-

আর তাহে সতিনী হেন আছএ পরিবাদে।
ঘরে হইতে বাহিরে দেখিলে পরমাদে।।[৬]

যে সতীন স্বামীকে নিজের বশে রাখতে পারতেন তিনি অন্য সতীন ও তার পুত্রকে নানা ভাবে যন্ত্রনা দিতেন। দ্বিজ পরশুরামের *কৃষ্ণমঙ্গল* কাব্যে দেখা যায় রাজা উত্তানপাদ বিবাহ করেন সুরূচি ও সুনীতি নামক দুই নারীকে। এই দুই সতীনের মধ্যে সর্বদাই কলহ লেগে থাকত। সুনীতির পাঁচ বছরের সন্তান ধ্রুবকে পিতা উত্তানপাদ ও বিমাতা সুরূচি ভাল চোখে দেখত না। তাকে সবসময় কটু কথা বলত। একদিন শিশু ধ্রুব পিতার কোলে উঠতে গেলে সুরূচি তাকে দুর্ভাগা বলে দূর করে দেন। আর পিতা উত্তানপাদও স্ত্রীর এই অমানবিক কাজের প্রতিবাদ করেন নি। ঐ দিকে সকল সুখ থেকে বঞ্চিত সুনীতি দাসীর মতো জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। সতীন দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে তিনি নিজের অধিকার বোধ ভুলে যান। এই ভাবে সে যুগে সতীন যন্ত্রনায় কোনো কোনো নারী নিজের অধিকারকে হারিয়ে দাসীতে পরিণত হতেন। সুনীতির মুখে তাই ধ্বনিত হয়েছে-

কান্দিয়া সুনীতি কহে গদ্গাদ বাণী।
সুন সুন ওরে বাছা মুঞী অভাগীনি।।
সুরূচি সতাই তোমার বাপের প্রিয়সি।
আমি তার আজ্ঞাকারি সে রাজমহিসি।।[৭]

এই ভাবে বিমাতা দ্বারা নিগৃহীত হতে হতে ধ্রুব একদিন গৃহ ত্যাগ করে বনে আশ্রয় নেয়।

আবার ভাগবতের কোথাও কোথাও সতীনদের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্কও দেখা যায়। ভাগবতের অনুবাদে বর্ণিত সতীন সমস্যার এই সকল ঘটনা ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন। স্বামীর অবহেলা ও সতীন দ্বারা নিগ্রহ এক শ্রেণির নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। যার ফলে তারা তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের স্বাভাবিক অধিকার হারিয়ে পরাধীন হয়ে পরত। আর এইভাবে তাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশও ঘটতে পারত না।

চার
অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী নারীর সামাজিক পদ মর্যাদা

নারীদের কর্মের অধিকার মধ্যযুগে স্বীকৃত ছিল। নারীরা স্বামীর আদেশে বা পরিবারকে স্বচ্ছল রাখার জন্য স্বেচ্ছায় নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতেন। ভাগবতের অনুবাদে দেখা যায় গোপ সমাজে নারীরা অর্থ উপার্জনের দিক থেকে এগিয়ে ছিল। গোপ নারীরা সাধারণত দুধ দোহন করত, দুধ মন্থন করে দই, মাখন, ছানা, ঘি প্রভৃতি গব্য উৎপাদন করে নিজেদের পরিবারকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করত। শুধু তাই নয় বাজারে গিয়ে সেই সব গব্য বিক্রি করে সংসার প্রতিপালন করতেও গোপ নারীদের দেখা যায়। গোপ নারীদের ঘরের বাইরে গিয়ে ব্যবসা করার অধিকার গোপ সমাজে স্বীকৃত ছিল যা মধ্যযুগীয় সমাজের এক বিশেষ সত্য।

আমরা *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখি গোপ কন্যা রাধা মথুরার হাটে যেতেন গোজাত দ্রব্য বিক্রি করতে। একই ভাবে ভাগবতের বিভিন্ন অনুবাদেও দেখা যায় গোপ রমণী রাধা মথুরার হাটে দই-দুধ বিক্রি করতে যেতেন বহু প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে। একবার রাধা সহ অন্যান্য গোপিনিরা মথুরার হাটে দই-দুধ বিক্রি করতে যান। সেখানে তারা কৃষ্ণের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এমনই একটি কৌতুকময় চিত্র পাওয়া যায় *গোপালবিজয়* কাব্যে-

কেহো চাছি ভাণ্ডে মাপে দুগ্ধ জোখে তুলে
কেহো ঘৃত মাপি দেই ঘোলের বোদলে।[৮]

যদি তাদের গব্য সামগ্রী কোনো কারণে বিক্রি না হত তাহলে সেই সব দ্রব্য নষ্ট হয়ে যেত, ফলে তাদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হত। নারীরা বহু কষ্ট সহ্য করে হাটে ব্যবসা করত। কখনো কখনো দ্রুত চলতে গিয়ে পায়ে আঘাত লাগত। হাটের পরিশ্রমে তারা ঘেমে একাকার হয়ে যেতেন; বিশ্রামের সময়টুকু পেতেন না।

অনেক নারী ফলের পসরা, খেলনা, সাজ-সজ্জার পসরা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ভ্রমণ করে জীবন ধারণ করত। ভাগবতের অনুবাদে দেখা যায় নিম্নবর্গীয় রমণীরা নিজেদের সংসার চালানোর জন্য ফল বিক্রির মত নানা ধরণের পেশায় নিযুক্ত হত। অধিকাংশ ভাগবতের অনুবাদে এক নিম্নবর্গীয় দুঃখিনী সবরি নারীর ফল বিক্রির প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এই সবরির মত অসহায় নারীরা গৃহস্থের বাড়ির কাছে এসে উচ্চস্বরে কে ফল নেবে বলে হাঁক দিত। আর যারা আগ্রহী তারা কড়ি বা ধান্যের বিনিময়ে ফল কিনে নিত-

এক দিনে গোকুলে আইল ফলহারী।
যতনে আনিল ফল ভরিঞা চুপরি।।
কে লবে কে লবে বলি ফলহারী ডাকে।
শুনিঞা ধাইল নিতে জতেক বালকে ।।
জননী নিকটে শিশু চাহি লয় কড়ি।
কেহো কোছে নিল কেহো নিল কর ভরি।। [৯]

এইভাবে কুল, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি ফল বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে নারীরা জীবন নির্বাহ করতেন।

এছাড়াও অনেক নারী গন্ধ-চন্দন বিক্রি করতেন। তাদের গন্ধ-অনুলেপন যেমন সাধারণ মানুষ সৌখিনতার জন্য ব্যবহার করতেন তেমনি রাজ পরিবারের সদস্যগণ তা সাজ-সজ্জার জন্য ব্যবহার করতেন। রাজা কংসের জন্য এক গন্ধকারী প্রতিদিন গন্ধ-চন্দন-অনুলেপ নিয়ে রাজাকে অনুলিপ্ত করতেন। এইভাবে তিনি কংসের কৃপায় বহু সম্পদ এবং ভূমি দানরূপে লাভ করে জীবন ধারণ করতেন। ভাগবতের অনুবাদে দেখা যায় কোনো কোনো রমণী রাজা বা অন্য কোনো বিত্তশালী ব্যক্তির গৃহে পাচিকার কাজ করেও জীবন ধারণ করতেন। আবার কোনো কোনো নারী জীবন ধারণের জন্য দেহব্যবসাও যে করতেন তারও তথ্যনিষ্ঠ ছবি ভাগবতের অনুবাদে পাওয়া যায়।

ভাগবতের অনুবাদ এবং ভাগবত অনুসারি সাহিত্য ধারায় দেখা যায় সমাজের প্রতিটি মানুষ তার নিজ নিজ সামর্থ অনুসারে কাজ করে সমাজকে সচল রাখত। নারীরা পুরুষের সমকক্ষ হয়েই কাজ করতেন। কর্মে নারীদের কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। কিন্তু ঘরের বাইরে কাজ করতে গিয়ে নারীরা লম্পট পুরুষের দ্বারা নানা ভাবে অত্যাচারিত হত।

পাঁচ
নারীত্বকে অপমান করার আর এক কৌশল নারীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন

সকল সমাজেই কলঙ্কের বোঝা নিয়ে বেঁচে থাকা মৃত্যুর সমান। সমাজে নারীর কলঙ্ক ছিল এক ভয়ানক অভিশাপ স্বরূপ। সমাজের স্বার্থান্বেষী মানুষরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিনা কারণেই নারীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করত। কলঙ্কিত নারীকে তার পরিবারও গ্রহন করত না। কারণ এমন কলঙ্কিত নারীকে যে পরিবার গ্রহণ করত সেই পরিবারকে সমাজ বহিষ্কার করত। সমাজের রক্তচক্ষুর ভয়ে ইচ্ছা থাকলেও পরিবার তাদের প্রিয় স্ত্রী বা বধূটিকে গ্রহণ করতে পারত না। আর সেই কলঙ্কের অপমানে নারীকে বেছে নিতে হত আত্মহত্যার পথ। ফলে সমাজের সবাই বিশেষ করে নারী সমাজ লোক অপবাদকে বড় ভয় করত। আর এই অপবাদ ভঞ্জন করার জন্য নারীকে নিজের সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হত বারবার।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীর উপর এই কলঙ্ক লেপন এবং তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য নারীর সতীত্ব পরীক্ষা প্রদানের বহু চিত্র পাওয়া যায়। *মনসামঙ্গল* কাব্য বেহুলার তুলা পরীক্ষা, সীতার অগ্নি পরীক্ষা তার প্রমাণ। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে রামায়ণে লোক অপবাদের মর্মান্তিক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। লোক মনোরঞ্জনের জন্য সীতাকে বারবার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সীতা অভিমানে ধরণী গর্ভে গমন করে লোকান্তরিত হন। কলঙ্ক নিয়ে সমাজে বেঁচে থাকা যে কত কষ্টকর তা সীতা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি শেষ পর্যন্ত লোকান্তরিত হন।

ভাগবতের অনুবাদেও লোক অপবাদের বাস্তব তথ্য পাওয়া যায়। তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী কালে সমাজে বিশৃঙ্খলার কারণে নারীর নিরাপত্তা ছিল না। যে কোনো সময় পুরুষ নারীর মর্যদা ভঙ্গ করতে দ্বিধা বোধ করত না। আর এই কথা সমাজে প্রচারিত হয়ে গেলে সেই নারীটির এবং তার পরিবারের দুর্দশার শেষ থাকত না। নারীরা অন্য কোনো পর পুরুষের সাথে কথা বললেই তখনকার মানুষ মনে করত যে সে অসতী। কোনো রমণীকে যদি কোনো পর পুরুষের সাথে কেউ দেখে ফেলত তাহলে তা অতি দ্রুত জন সমাজে প্রচারিত হয়ে যেত। তখন ঐ রমণীর ঘরে-বাইরে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে উঠত। ঘরে শ্বাশুড়ি-ননদিনি তাকে গঞ্জনা দিত আর বাইরে নগরের লোক ছি ছি করত। ফলে নারীকে সদা সর্বদাই আতঙ্কের মধ্যে ঘরে-বাইরে দিন যাপন করতে হত। ভবানন্দ রচিত *হরিবংশ* কাব্যে তাই রাধা বলেছেন-

আমি গরবিত একে, যদি আসি কেহ দেখে
তোমার আমার মান-ভঙ্গ।
সকল নাগরী-লোকে চূণ কালি দিব মূখে
না যুয়ায় তুমি আমি সঙ্গ।।
শাশুড়ী পরাণের বৈরী এ কথা শুনিব করি
সদা মোর মনের আতঙ্ক। [১০]

অন্য দিকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যে ঐ কলঙ্কিত নারীটিকে ইচ্ছা থাকলেও গ্রহণ করতে পারে না তারও কারণ ছিল। কারণ সংশ্লিষ্ট পরিবারটিকে তখন সমাজ নানা ভাবে অপদস্ত করত। তাদের জল-চল বন্ধ করে দিত। এমনকি তাদের সমাজ চুত্য করা হত। এই ভয়ে পরিবারও নারীটিকে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারত না। এমন অবস্থায় শ্বাশুড়ির আক্ষেপের সীমা থাকত না। কারণ অপয়া বধূটির কারণে সমাজে তাদের মান-মর্যাদা নষ্ট হয়েছে বলে তারা মনে করত। তখন শ্বাশুড়ি কথায় কথায় সেই রমনীটির উপর বাক্যবাণ হানত-

শরীরে না সহে মোর এত বড় দুখ।
পুত্র-বধূর প্রসাদে যে পোড়া গেল মুখ।।[১১]

তাই নারীদের পক্ষে অপবাদ নিয়ে জীবন যাপন করা দুর্বিষহ হয়ে পড়ত। পরের মুখে শুনে নিজের স্ত্রীকে সন্দেহ করার প্রবণতা দেখা যেত গোপ সমাজে। ফলে গোপ-স্ত্রীরা স্বামীর এমন নির্দয় আচরণে ভেঙ্গে পড়তেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল ভিত্তি বিশ্বাস। এই বিশ্বাসহীন সম্পর্ক নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। তাই এই অবস্থায় স্ত্রীদের আত্মহত্যা ছাড়া আর উপায় থাকত না। তাই ভবানন্দের *হরিবংশ* কাব্যে এক গোপিনি স্বামীকে জানান মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার চেয়ে তাকে মেরে ফেলা অনেক শ্রেয়। কারণ কলঙ্কিত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা মৃত্যুর চেয়েও বেদনা দায়ক।-

না জানিয়া কহ কেনে শুনি পর-মুখে।
গরল ভক্ষিয়া মুই মরিমু এই দুখে।।
মিথ্যা-পরিবাদ যদি বোলিবার পার।
ইহা হনে ভাল – যদি প্রাণে মোকে মার।। [১২]

মধ্যযুগে নারীত্ব নানা ভাবে ভূলুণ্ঠিত হত। নারীর চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করে এক শ্রেণির মানুষ নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে চাইত। আর বিশেষ করে নারীরাই নারীদের চরিত্রে আঙুল তুলত। ফলে নারীদের দ্বারাই নারীরা অবহেলিত ও অত্যাচারিত হত।

কিছু কিছু নারী ছিল স্বভাব সুলভ স্বৈরিণী। তারা নিজের স্বার্থ ও সুখের জন্য পরকীয়ায় লিপ্ত হত। যার ফলে তার পরিবার সমাজে মুখ দেখাতে পারত না। পাশাপাশি এই কথাও সত্য যে, কোনো নারী যদি স্বামীর কাছ থেকে দৈহিক সুখ লাভ না করে পারে, তবে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন। ভবানন্দের *হরিবংশ* কাব্যে দেখা যায় রাধার স্বামী আয়মন ছিল নপুংসক। ফলে রাধা তার চাহিদা অনুযায়ী স্বামীর কাছ থেকে দৈহিক সুখ লাভ করতে পারত না। ফলে রাধা ধীরে ধীরে তার ভাগ্নে কৃষ্ণের সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় নারীর সনাতন আদর্শকে এই বিষয়টি আহত করে; যাকে মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজ কোনো ভাবেই মেনে নেয়নি বা এখনও মেনে নেওয়া হয় না।

ছয়
পুরুষতন্ত্রের অত্যাচারে পীড়িত মানবতা

এখনও পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে নারীর উপর অত্যাচার সংগঠিত হয়ে চলছে অহরহ। পারিবারিক ভাবে স্বামী যেমন স্ত্রীর উপর অত্যাচার করত তেমনি সমাজের কিছু কাপুরুষও নারীদের উপর অত্যাচার করত। কারণ তারা নারীকে নিজের সম্পত্তি এবং ভোগের পণ্য ভাবত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি আক্রমণের পর সমাজে অব্যবস্থা দেখা দেয়, আর এই সুযোগে সমাজের কিছু ক্ষমতাশালী মানুষ বিত্ত ও ক্ষমতার দম্ভে নারীদের উপর নানা ভাবে অত্যাচার করত।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পুরুষ কর্তৃক নারীর উপর অত্যাচারের নানা তথ্য পাওয়া। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে কৃষ্ণ কর্তৃক অবলা গোপিনিদের উপর অত্যাচার করার চিত্র দেখা। কোনো কোনো ভাগবতের অনুবাদ ও ভাগবত অনুসারী সাহিত্যে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের কৃষ্ণ চরিত্রেরই অনুরূপ প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে কৃষ্ণ প্রতিহিংসা পরায়ণ, নারী দেহলোলুপ এবং ক্রুর প্রকৃতির। সে নারীদের উপর নিজের বল প্রয়োগ করে নিজের অহমিকা প্রকাশ করত। গোপিনিরা যখন হাটে যেত তখন তাদের পথ আটক করত। এরপর তাদের পসরা লুট করত, দই-দুধ নষ্ট করে দিত। কৃষ্ণের ভয়ে গোপ নারীরা পথে একা বের হতে ভয় পেত। তাই *গোপালবিজয়* কাব্যে রাধা কৃষ্ণের যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে মনের দুঃখে যমুনার জলে জীবন বিসর্জন দেওয়ার কথা বলেছেন। কারণ ঘরে শাশুড়ি-ননদিনির যন্ত্রনা আর ঘরের বাইরে কৃষ্ণের জ্বালায় তাদের বেঁচে থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল-

ঘর জাইতে শাশুড়ী শ্বশুরে ভঅ করি
বিকে জাইতে বাদী হঞা লাগিয়া মুরারি।
না জাইহ বিকে বড়াই না জাইব ঘরে
সভে মেলি ঝাপ দিব জমুনার নীরে। [১৩]

কৃষ্ণের যত বল প্রয়োগ তা শুধু দুর্বল ও অবলা নারীদের উপরই। গোয়ালা বধূদের দুর্বল পেয়ে তাদের শ্লীলতাহানী করতে সে দ্বিধা বোধ করত না। অথচ তার চেয়ে শক্তিমান ও ক্ষমতাশালী মানুষের ভয়ে সে সর্বদাই স্বন্ত্রস্ত থাকত। শক্তিমান কংসের নামেই সে লুকিয়ে যেত। তাই রাধা কৃষ্ণকে কংসের কথা বলে নিজের আত্মসম্মান রক্ষার চেষ্টা করেছিল।

ভাগবতের অনুবাদে নারীর উপর পুরুষের অত্যাচারের আরও ভয়াবহ তথ্য পাওয়া যায়। শক্তিমান পুরুষরা নিজেদের বলের অহংকারে মত্ত হয়ে সকল নারীকেই ভোগের সামগ্রী ভাবত। যথেচ্ছ ভাবে নারীদের লুণ্ঠন করে

নিজের কারাগারে বন্দী করে রাখার চিত্র ভাগবতের অনুবাদে দেখা যায়। নরকাসুর শক্তির অভিমানে অন্ধ হয়ে ষোল হাজার রাজকন্যাকে নিজের কারাগারে বন্দী করে অত্যাচার করেছিল। দুর্বল রাজাদের পরাজিত করে তার অন্তঃপুরের কন্যাদের হরণ করা ছিল নরক রাজার শখ। এই শখ নারী জাতির পক্ষে ছিল চরম অবমাননাকর। নরক রাজার নারীর উপর অত্যাচারের করুণ চিত্র মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* কাব্যে উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠেছে-

কুড়ি সহশ্চ কন্যা বিভা করিব একুবারে।
তথির কারনে দেব দানবের কন্যা হরে।।
জেই জেই রাজা সব বৈসে তৃভূবনে ।
সভাকে জিনিঞা কন্যা আনিল ভূবনে।।
ষূরপ্তি জিনিঞা আনিল অপ্সরী।
আদিতীর কুণ্ডল দুই আনিলেক হরী।। [১৪]

স্বামী হল স্ত্রীদের নিরাপত্তার প্রধান অবলম্বন। মধ্যযুগে স্বামী পরিত্যক্তা এবং বিধবা নারীর বেঁচে থাকা ছিল বড় দায়। বিধবা নারীদের দেহ লাভের আশায় প্রলোভন দেখানো, ভয় দেখানো আর শেষ পর্যন্ত তাদের উপর বলপ্রয়োগ করা ছিল সে যুগের নিত্য চিত্র। মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* কাব্যে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তার অসহায় স্ত্রীদের উপর নেমে আসে এমনই অত্যাচার। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পড়ে অর্জুনের উপর। অর্জুন তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু পথে ঘটে বিপত্তি। কৃষ্ণের স্ত্রীদের প্রতি লোভ করে তাদের হরণের জন্য পথে আক্রমণ করে দৈত্যরাজ এবং তার বন্ধগণ। অর্জুন শত চেষ্টা করেও তাদের শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তাদের এই অসহায়তার বাস্তব চিত্র মালাধর বসুর লেখনীতে ধরা পড়েছে-

নারিগন মধ্যে গিয়া দৈত্যগন বেড়ে।
কার হাথে ধরি কাহার কাপড়ে।।
পাঁচ সাত নারি লৈয়া এক এক জনে।
নারি লৈয়া যায় অর্জুন বিদ্যমানে।। [১৫]

নারীদের উপর এই অত্যাচার সে যুগের অস্থির সমাজ ব্যবস্থায় নারীর মর্যদা ও নিরাপত্তা কেমন ছিল তা মনে করিয়ে দেয়। তাছাড়া বিবাহের জন্য নারী হরণের নানা চিত্র ভাগবতের অনুবাদে দেখা যায়।

সাত
নারীর বড় শত্রু নারী

যে নারী কখনো বধূ সে নারীই কখনো শাশুড়িতে রূপান্তরিত হন। শাশুড়ি বলতেই বধূদের গঞ্জনাকারী এক মূর্তি ভেসে উঠে। কিন্তু এমন অনেক শাশুড়ি আছেন যিনি বধূকে কন্যারূপে স্নেহ করেন, যদিও সংখ্যাটা নগণ্য। পুত্রবধূকে নিজের কন্যার মত ভেবে তাকে গ্রহণ করা অনেক শাশুড়ি দ্বারাই সম্ভব হত না। নানা অজুহাতে শাশুড়ি বধূকে নির্যাতন করত। স্বামী পর্যন্ত স্ত্রীর হয়ে মার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করত না। কারণ সেও তাঁর স্ত্রীকে পরনির্ভশীল মূর্খ ভেবে মর্যাদা দিত না। সেই বধূ নিজেও জানেন তিনি স্বামী-শাশুড়ি আশ্রিতা, তারা তাকে বের করে দিলে তাকে সমাজ গ্রহণ করবে না। ফলে তাকে পথে পথে ঘুরতে হবে। তাই বধূটি স্বামী শাশুড়ির গঞ্জনা-অত্যাচার সব মুখ বুঝে সহ্য করতেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শাশুড়ি কর্তৃক বধূ নির্যাতনের ঘটনা কমই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ভাগবতের অনুবাদে বধূর উপর শাশুড়ি ও ননদিনির অত্যাচারের ঘটনা বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে; যা তৎকালীন সমাজের প্রকৃত চেহারাটি তুলে ধরে।

ভবানন্দ ভাগবতের বিষয় নিয়ে যে *হরিবংশ* রচনা করেন তাতে শাশুড়ি ও ননদিনি কর্তৃক বধূ নিপীড়ণের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ননদিনি বৌদির উপর সর্বদাই নজর রাখত। কোনো দোষ পেলেই ননদিনি শাশুড়ির কাছে বৌদির নামে নালিশ করত। ফলে নারীরা ননদিনিকে বাঘের মত ভয় পেত। *হরিবংশে* কাব্যে দেখা যায় কৃষ্ণ রাধা ও গোপিনিদের বস্ত্রালংকার লুকিয়ে রাখলে কোনো গোপিনিই গৃহে গিয়ে বস্ত্র আনতে প্রস্তুত হয়নি। কারণ ননদিনি দেখতে পেলে তা তার শাশুড়ির কাছে জানাবে আর এর ফলে তাদের বেঁচে থাকা কষ্ট হয়ে উঠবে। তাই একজন গোপিনি অন্যজঙ্কে বলেছিল-

তুমি সবের ননদী রহিছে নিজ ঘরে।
ননদী নাহিক যার-আনহ সত্বরে।।
ননদীর ডরে নাহি যাও গোবিন্দের কাছে।
সেহি কাল-ননদী আছে আমার সঙ্গে।। [১৬]

শুধু তাই নয় রাধা তার ভাগিনা কৃষ্ণের সাথে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত এই অপবাদ দিয়ে রাধার ননদিনি মহোদা নানাভাবে রাধাকে অপদস্ত করেন। তার মতে রাধা এমন জঘণ্য কর্ম করেছেন যে তাদের পক্ষে গোকুলে মুখ দেখানো দায় হয়ে পড়েছে। এই কুলটা নারীর পাপের কারণে তাদের সংসারের সর্বনাশ হবে। এই সব বলেই মহোদা ক্ষান্ত হননি, তিনি তার মা আর শাশুড়িকে তার এই অপকর্মের কথা বলে দেবার ভয় পর্যন্ত দেখান-

মোর বিহা নহে তোর পাপের কারণে।
তথাপি পাতকী রাধা পাপে কর মন।।
এই কথা কহিমু গিয়া জননীর স্থানে।
মোর ভাই আইলে শাস্তি পাইবা ভাল-মনে।। [১৭]

বউদিকে অপদস্ত করার জন্য ননদিনি মহোদা তার মার কাছে রাধার এই সব অপকর্মের কথা বাড়িয়ে বলেন। ফলে তিনি রাধাকে বিভিন্ন কুকথা বলে ভর্ৎসনা করেন-

গলায় কলসী বান্ধি মর গিয়া রাধা।
ভাগিনার সনে রতি আর ভুঞ্জে কেবা।
স্বামীর অধিক করি কর তার সেবা।।
এ সব চরিত্র ভাল যে হয় চতুর।
নিজ পতি পরিহরি ভিন্ন সে মধুর।।
সবে এক পুত্র মোর বধূ তার ভাল।
আমারে রাখিছে বিধি ঘরের জঞ্জাল।। [১৮]

রাধার শাশুড়ি এতেই ক্ষান্ত হননি, রাধার অবৈধ সম্পর্কের কথা রাধার বাপের বাড়িতে গিয়ে জানিয়ে আসেন। অভাগী রাধার কুলটা হবার কথা শুনে সংস্কারাচ্ছন্ন রাধার মা বিমলাও রাধাকে যথেচ্ছ পরিমানে গালি দেন। তখন অভাগী রাধার মত নারীদের মাথা হেঁট করে কান্না ছাড়া আর গতি থাকে না।

আট

মধ্যযুগীয় সমাজে নারীদের অবস্থান যে ভাল ছিল না তার ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় মধ্যযুগে রচিত বাংলা সাহিত্যে। ভাগবতের অনুবাদেও মধ্যযুগীয় সমাজে নারীর স্থানটি স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। নারীরা যে তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী বিশৃঙ্খল সমাজ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল তা ভাগবতের অনুবাদ ও অনুসারী সাহিত্যে বাস্তব সম্মত ভাবে চিত্রিত হয়েছে। ভাগবতের অনুবাদ ও ভাগবত অনুসারী সাহিত্যে প্রতিফলিত নারীদের

পরাধীন জীবনের গ্লানিই প্রমান করে যে সে যুগে পারিবারিক ও সামাজিক কোনো স্থানেই নারী মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল না। যদিও চৈতন্য পরবর্তী কোনো কোনো সাহিত্যে নারীর সামাজিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। কিন্তু সামগ্রীক ভাবে সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপী নারীর সামাজিক মর্যাদা সন্তোষজনক ছিল না। ভাগবতের অনুবাদ ও ভাগবত অনুসারী সাহিত্যে প্রতিফলিত নারীর জীবনবোধ সে কথাকেই প্রমাণ করে।

সূত্র নির্দেশ ও মন্তব্য :

১। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *মনুসংহিতা*, সপ্তম মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ, ২০১৫, পৃ. ২৪৮
২। দৈবকীনন্দন সিংহ, *গোপালবিজয়*, দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা, প্রথম প্রকাশ, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, ১৩৭৩, পৃ. ২০২
৩। ভবানন্দ, *হরিবংশ*, সতীশচন্দ্র রায় সম্পা, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৩৯, পৃ. ১১৪
৪। পরশুরাম, *কৃষ্ণমঙ্গল*, নলিনীকান্ত দাসগুপ্ত সম্পা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃ. ৪৫৫
৫। ঐ, পৃ. ৪৫৭
৬। দৈবকীনন্দন সিংহ, *গোপালবিজয়*, দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা, প্রথম প্রকাশ, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, ১৩৭৩, পৃ. ২৬৩
৭। পরশুরাম, *কৃষ্ণমঙ্গল*, নলিনীকান্ত দাসগুপ্ত সম্পা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃ. ১৪
৮। দৈবকীনন্দন সিংহ, *গোপালবিজয়*, দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা, প্রথম প্রকাশ, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, ১৩৭৩, পৃ. ১৮৯
৯ । কৃষ্ণদাস, *শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল*, তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৩, পৃ. ৭৮
১০। ভবানন্দ, *হরিবংশ*, সতীশচন্দ্র রায় সম্পা, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৩৯, পৃ. ৯৫
১১। ঐ , পৃ. ৭৮
১২। ঐ, পৃ. ১০৬
১৩। দৈবকীনন্দন সিংহ, *গোপালবিজয়*, দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা, প্রথম প্রকাশ, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, ১৩৭৩, পৃ. ১৭৬
১৪। মালাধর বসু, *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*, অমিত্রসূধন ভট্টাচার্য ও সুমঙ্গল রাণা সম্পা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, রত্নাবলী, ২০০৩, পৃ. ৩০৫
১৫। ঐ, পৃ. ৪৬৭
১৬। ভবানন্দ, *হরিবংশ*, সতীশচন্দ্র রায় সম্পা, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৩৯, পৃ. ১১৬
১৭। ঐ, পৃ. ৩৯
১৮। ঐ, পৃ. ৪০

আকর গ্রন্থ (প্রকাশিত ও নির্বাচিত) :

১। কৃষ্ণদাস, *শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল*, তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৩
২। দৈবকীনন্দন সিংহ, *গোপালবিজয়*, দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা, প্রথম প্রকাশ, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, ১৩৭৩

৩। পরশুরাম, *কৃষ্ণমঙ্গল*, নলিনীকান্ত দাসগুপ্ত সম্পা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭
৪। ভবানন্দ, *হরিবংশ*, সতীশচন্দ্র রায় সম্পা, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৩৯
৫। মালাধর বসু, *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*, অমিত্রসূধন ভট্টাচার্য ও সুমঙ্গল রাণা সম্পা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, রত্নাবলী, ২০০৩